ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ২য় পর্ব

ফিকহ ৩য় পত্র: উসূলুল ফিকহ ও আসরারুশ শরীয়াহ

খ বিভাগ: আসরারুশ শরীয়াহ (রচনামূলক প্রশ্ন)

গ্রন্থ পরিচিতি (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ)

১১. শাহ ওয়ালী উল্লাহর রচিত “হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ” কিতাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য (মুমাইয়্যাযাত) ও স্বাতন্ত্র্য (খাসায়িস) কী কী? এ কিতাবের নাম রাখার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। (ما هي المميزات والخصائص الرئيسية لكتاب "حجة الله البالغة" الذي ألفه الشاه ولي الله؟ واشرح المغزى من تسمية الكتاب بهذا الاسم)

১২. “হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ” কিতাবে লেখক শরীয়তের রহস্য (আসরারুশ শরীয়াহ) উন্মোচনের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি (মানহাজ) অবলম্বন করেছেন? (ما هو المنهج الذي اتبعه المؤلف في كتاب "حجة الله البالغة" عند كشف أسرار الشريعة؟)

১৩. শরীয়তের রহস্য ও ফিকহের মূলনীতি নিয়ে লেখা কিতাবসমূহের মধ্যে “হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ” কিতাবের স্থান ও মর্যাদা (মানজিলা) কেমন? (ما هي منزلة كتاب "حجة الله البالغة" بين كتب أسرار الشريعة وأصول الفقه؟)

১৪. ইসলামী আইন ও দর্শন বোঝার জন্য “হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ” কেন একটি অপরিহার্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়? (لماذا يعتبر كتاب "حجة الله البالغة" كتابا لا غنى عنه لفهم التشريع والفلسفة الإسلامية؟)

১৫. ওলামাগণের নিকট “হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ” কিতাবটির প্রতি কেন বিশেষ “এনায়েত” (মনোযোগ) ছিল? কিতাবের ওপর রচিত বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো কী কী? (لماذا كان لكتاب "حجة الله البالغة" عناية خاصة عند العلماء؟ وما هي الشروح المشهورة التي ألفت على الكتاب؟)

১৬. “হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ” কিতাবে শাহ ওয়ালী উল্লাহ কীভাবে ইবাদত (ইবাদাত) ও মু‘আমালাত (লেনদেন)-এর বিধানগুলোর দার্শনিক ভিত্তি ও রহস্য ব্যাখ্যা করেছেন? (كيف شرح الشاه ولي الله في كتابه "حجة الله البالغة" الأسس الفلسفية والأسرار لأحكام العبادات والمعاملات؟)

১৭. ইসলামী দর্শনে শাহ ওয়ালী উল্লাহর অবদান কী? এ কিতাবে বর্ণিত "ইরতিফাকাত" (ইরতিফাকাত)-এর ধারণাটি বিশ্লেষণ কর। (ما هي مساهمة الشاه ولي الله في الفلسفة الإسلامية؟ وحلل مفهوم "الارتفاقات" المذكور في هذا الكتاب)

১৮. "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ" কিতাবে বর্ণিত শরীয়তের সর্বজনীন উপকারিতা (মাসালিহুল কুল্লিয়্যাহ) ও এর উদ্দেশ্য (মাকাসিদুশ শরীয়াহ)-এর মূলনীতিগুলো কী কী? (ما هي المبادئ الأساسية للمصالح الكلية ومقاصد الشريعة المذكورة في كتاب "حجة الله البالغة"؟)

১৯. এ কিতাবের মাধ্যমে শাহ ওয়ালী উল্লাহ কীভাবে সুন্নাহ ও সুন্নাহর সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন? (كيف أبرز الشاه ولي الله أهمية السنة وحفظها من خلال هذا الكتاب؟)

২০. "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ" কিতাবটি কেন ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী চিন্তা ও শিক্ষায় একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিল- বিশ্লেষণ কর। (حلل لماذا أحدث كتاب "حجة الله البالغة" تغييرا جذريا في الفكر والتعليم الإسلامي في شبه القارة الهندية؟)

১১. শাহ ওয়ালী উল্লাহর রচিত "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ" কিতাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য (মুমাইয়্যাযাত) ও স্বাতন্ত্র্য (খাসায়িস) কী কী? এ কিতাবের নাম রাখার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

(ما هي المميزات والخصائص الرئيسية لكتاب "حجة الله البالغة" الذي ألفه الشاه ولي الله؟ واشرح المغزى من تسمية الكتاب بهذا الاسم)

ভূমিকা:

ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) রচিত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' (حجة الله البالغة) একটি কালজয়ী ও বিস্ময়কর গ্রন্থ। এটি কেবল একটি ফিকহ বা হাদিসের কিতাব নয়, বরং এটি শরীয়তের দর্শন বা 'আসরারুশ শরীয়াহ'-এর ওপর রচিত এক বিশ্বকোষ। এ গ্রন্থে লেখক শরীয়তের বিধানগুলোর যৌক্তিকতা এমনভাবে তুলে ধরেছেন যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের অভিভূত করেছে।

নামকরণের তাৎপর্য (مغزى التسمية):

লেখক এ কিতাবের নাম রেখেছেন 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'। এই নামটি পবিত্র কুরআনের সূরা আন'আমের ১৪৯ নং আয়াত থেকে চয়ন করা হয়েছে:

"فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ"

(অর্থ: অতএব, আল্লাহর জন্যই চূড়ান্ত বা অকাট্য দলিল।)

তাৎপর্য:

১. আল্লাহর অকাট্য দলিল: শাহ ওয়ালী উল্লাহ বোঝাতে চেয়েছেন যে, ইসলামি শরীয়ত কোনো ভিত্তিহীন প্রথা নয়। এর প্রতিটি বিধানের পেছনে আল্লাহর অকাট্য যুক্তি বা 'হুজ্জাত' রয়েছে। এই কিতাব সেই যুক্তিগুলোকেই প্রকাশ করেছে।

২. সন্দেহ নিরসন: নাস্তিক বা সমালোচকরা শরীয়তের যেসব বিধানকে অযৌক্তিক মনে করত, এই কিতাব তাদের মুখের ওপর আল্লাহর 'চূড়ান্ত দলিল' হিসেবে ছুড়ে দেওয়া হয়েছে।

কিতাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য (الخصائص والمميزات):

১. শরীয়তের রহস্য উদ্ঘাটন (আসরারুশ শরীয়াহ):

এই কিতাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এতে ইবাদত (নামাজ, রোজা, হজ) এবং মু'আমালাতের (লেনদেন, রাজনীতি) বিধানগুলোর পেছনের হিকমত ও আধ্যাত্মিক রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। লেখক দেখিয়েছেন যে, শরীয়তের প্রতিটি হুকুম মানব কল্যাণের (মাসলাহাত) সাথে জড়িত।

২. হাদিস ও আকলের সমন্বয়:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ ওহীর বিধানকে (নকল) মানুষের সুস্থ বিবেকের (আকল) সাথে মিলিয়েছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, সহীহ হাদিস এবং সুস্থ বিবেক কখনো সাংঘর্ষিক হতে পারে না।

৩. ইরতিফাকাত বা সমাজবিজ্ঞান:

কিতাবটিতে 'ইরতিফাকাত' (সামাজিক বিবর্তনের ধাপ) নিয়ে এক অভিনব আলোচনা রয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে মানুষ জঙ্গল থেকে সমাজবদ্ধ জীবনে এবং সেখান থেকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় উপনীত হয়েছে। অনেক আধুনিক গবেষক মনে করেন, সমাজবিজ্ঞানের জনক হিসেবে ইবনে খালদুনের পরেই শাহ ওয়ালী উল্লাহর স্থান।

৪. হাদিস ও ফিকহের তাতবীক (সমন্বয়):

এ গ্রন্থে তিনি হানাফি ও শাফেয়ী মাযহাবের বিরোধপূর্ণ মাসআলাগুলোকে হাদিসের আলোকে সমন্বয় করেছেন। তিনি ফিকহী গোঁড়ামি পরিহার করে ইনসাফভিত্তিক মতামতের ওপর জোর দিয়েছেন।

৫. ভাষার অলংকার:

যদিও শাহ ওয়ালী উল্লাহ অনারব (আজমী) ছিলেন, তবুও এই কিতাবের আরবি ভাষা অত্যন্ত উচ্চমানের এবং অলংকারসমৃদ্ধ। আরব বিদ্বানরাও তাঁর ভাষার প্রাঞ্জলতা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

উপসংহার:

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' ইসলামি দর্শনের মুকুটে এক উজ্জ্বল পালক। এর বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তুর গভীরতা এটিকে সাধারণ কিতাবের স্তর থেকে অনেক উঁচুতে আসীন করেছে। এটি কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামি শরীয়তের যৌক্তিকতা প্রমাণের এক অকাট্য দলিল হিসেবে টিকে থাকবে।

১২. "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ" কিতাবে লেখক শরীয়তের রহস্য (আসরারুশ শরীয়াহ) উন্মোচনের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি (মানহাজ) অবলম্বন করেছেন? (ما هو المنهج الذي اتبعه المؤلف في كتاب "حجة الله البالغة" عند كشف أسرار الشريعة؟)

ভূমিকা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' কিতাবে শরীয়তের বিধানাবলির রহস্য উন্মোচনের জন্য একটি সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বা 'মানহাজ' (Methodology) প্রবর্তন করেছেন। তাঁর এই পদ্ধতি গতানুগতিক ছিল না, বরং তা ছিল ইস্তিকরা (আরোহী) এবং বুরহান (প্রামাণিক) পদ্ধতির সংমিশ্রণ।

অনুসৃত পদ্ধতি বা মানহাজ (المنهج المتبع):

১. মূলনীতির ওপর ভিত্তি স্থাপন (তাসীসুল কায়াইদ):

লেখক সরাসরি মাসআলার রহস্য বর্ণনা শুরু করেননি। কিতাবের প্রথম খণ্ডে তিনি কিছু মৌলিক নিয়ম বা 'মাবাদি' (Principles) আলোচনা করেছেন। যেমন—মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য, রুহের জগত, পুণ্যের (বিরর) হাকিকত ইত্যাদি। এই মূলনীতিগুলো বুঝলে পরবর্তী বিধানের রহস্য বোঝা সহজ হয়।

২. মানব স্বভাবের বিশ্লেষণ (ফিতরাত):

তিনি শরীয়তের বিধানকে মানুষের স্বভাবজাত চাহিদা বা 'ফিতরাত'-এর সাথে মিলিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, শরীয়ত মানুষের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া কোনো বোঝা নয়, বরং এটি মানুষের আত্মিক ও সামাজিক প্রয়োজনেরই প্রতিফলন।

৩. মাসলাহাত ও মাকাসিদ:

তাঁর পদ্ধতির মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল 'মাসলাহাত' (জনকল্যাণ)। তিনি প্রতিটি হুকুমের পেছনে দুটি দিক খুঁজে বের করেছেন:

- **ব্যক্তিগত উপকার:** যেমন—নামাজ আত্মশুদ্ধি করে।

- **সামাজিক উপকার:** যেমন—নামাজ সামাজিক শৃঙ্খলা ও ঐক্য তৈরি করে।

৪. ইস্তিকরা (Inductive Method):

তিনি হাজার হাজার হাদিস ও ফিকহী মাসআলা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ (Survey) করে সেখান থেকে সাধারণ সূত্র বের করেছেন। যেমন—তিনি দেখেছেন পবিত্রতা, নামাজ ও রোজার মধ্যে একটি সাধারণ মিল আছে, আর তা হলো 'নফসের দমন'।

৫. মধ্যপন্থা (ই'তিদাল):

তিনি মু'তাযিলাদের মতো শুধু যুক্তির ওপর নির্ভর করেননি, আবার জাহেরীদের মতো শুধু শব্দের ওপরও বসে থাকেননি। তিনি ওহীর আলোকে যুক্তি ব্যবহার করেছেন। তাঁর ভাষায়—"শরীয়তের বিধান কারণহীন নয়, তবে সেই কারণ আল্লাহর হিকমতের অধীন।"

৬. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

তিনি অনেক বিধানের রহস্য বোঝাতে তৎকালীন আরব সমাজের প্রথা ও অভ্যাসের উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বুঝিয়েছেন যে, কিছু বিধান সেই সময়ের মানুষের অভ্যাসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেওয়া হয়েছে।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কারণেই 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' কেবল বিশ্বাসীদের জন্য নয়, বরং বুদ্ধিজীবী মহলের জন্যও একটি গবেষণার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামি আইন একটি জীবন্ত ও যৌক্তিক ব্যবস্থা।

---

১৩. শরীয়তের রহস্য ও ফিকহের মূলনীতি নিয়ে লেখা কিতাবসমূহের মধ্যে “হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ” কিতাবের স্থান ও মর্যাদা (মানজিলা) কেমন? (ما هي منزلة كتاب "حجة الله البالغة" بين كتب أسرار الشريعة وأصول الفقه؟)

ভূমিকা:

ইসলামি গ্রন্থাগারের বিশাল ভান্ডারে লক্ষ লক্ষ কিতাব রয়েছে। কিন্তু এমন কিছু কিতাব আছে যা নিজেই একটি ইতিহাস এবং একটি আন্দোলন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) রচিত ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ’ তেমনই একটি গ্রন্থ। ‘ইলমে আসরারুশ শরীয়াহ’ বা শরীয়তের রহস্য বিদ্যায় এই কিতাবের স্থান অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়।

কিতাবের স্থান ও মর্যাদা (المكانة والمنزلة):

১. আসরারুশ শরীয়াহর প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর পূর্বে ইমাম গাজালি (রহ.) তাঁর ‘ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন’ এবং ইজ্জুদ্দিন বিন আব্দুস সালাম (রহ.) তাঁর ‘কাওয়ায়েদুল আহকাম’-এ শরীয়তের রহস্য নিয়ে আংশিক আলোচনা করেছেন। কিন্তু শাহ ওয়ালী উল্লাহই সর্বপ্রথম এই বিষয়টিকে একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র (Science) হিসেবে রূপ দিয়েছেন। একারণে তাঁকে এই শাস্ত্রের ‘মুজাদ্দিদ’ বলা হয়।

২. ইমাম গাজালি ও শাতিবীর সাথে তুলনা:

- **ইমাম গাজালি (রহ.):** তাঁর কিতাব ‘ইহইয়া’ মূলত আধ্যাত্মিকতা ও তাসাউফ নির্ভর।
- **ইমাম শাতিবী (রহ.):** তাঁর কিতাব ‘আল-মুওয়াফাকাত’ উসূল ও মাকাসিদের ওপর জোর দিয়েছে।
- **শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.):** তাঁর ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ’ গাজালির আধ্যাত্মিকতা এবং শাতিবীর মাকাসিদের এক অপূর্ব সমন্বয়। এতে হাদিসের ব্যাখ্যা ও ফিকহের দর্শন একসাথে পাওয়া যায়।

৩. আরব বিশ্বের স্বীকৃতি:

সাধারণত অনারব (আজমী) আলেমদের কিতাব আরব বিশ্বে খুব বেশি সমাদৃত হয় না। কিন্তু 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' এর ব্যতিক্রম। মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরব বিশ্বের বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এটি পাঠ্যবই হিসেবে পড়ানো হয়। আরব বিদ্বানরা বলেন:

"لَمْ يُؤَلَّفْ مِثْلُهُ فِي الْإِسْلَامِ"

(ইসলামে এর মতো আর কোনো কিতাব রচিত হয়নি।)

৪. ইলমী গুরুত্ব:

ভারতীয় উপমহাদেশে হাদিস ও ফিকহের পুনর্জাগরণে এই কিতাবের ভূমিকা অপরিসীম। এটি মাযহাবী সংকীর্ণতা দূর করে এবং উম্মতকে কুরআন-সুন্নাহর প্রশস্ত রাজপথে নিয়ে আসে। আধুনিক যুগের ইসলামি চিন্তাবিদদের জন্য এটি একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ।

৫. ফিকহ ও হাদিসের সেতুবন্ধন:

এই কিতাবটি হাদিসের মুহাদ্দিস এবং ফিকহের ফকীহ—উভয় শ্রেণীর কাছে সমানভাবে সমাদৃত। মুহাদ্দিসরা এতে হাদিসের ব্যাখ্যা পান, আর ফকীহরা পান বিধানের দলিল ও দর্শন।

উপসংহার:

সংক্ষেপে বলা যায়, 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' হলো ইসলামি জ্ঞানের এক মহাসাগর। আসরারুশ শরীয়াহর ক্ষেত্রে এটি সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করছে। যতদিন ইসলামি দর্শন ও শরীয়তের হিকমত নিয়ে আলোচনা হবে, ততদিন এই কিতাবের নাম শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হবে।

১৪. ইসলামী আইন ও দর্শন বোঝার জন্য “হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ” কেন একটি অপরিহার্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়?

(لماذا يعتبر كتاب "حجة الله البالغة" كتابا لا غنى عنه لفهم التشريع والفلسفة الإسلامية؟)

ভূমিকা:

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) রচিত ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ’ কেবল একটি কিতাব নয়, বরং এটি একটি বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব। ইসলামী আইন (ফিকহ) এবং দর্শন (হিকমত) বোঝার জন্য এই গ্রন্থটি এতটাই অপরিহার্য যে, গবেষকগণ এটিকে ‘ইসলামী জ্ঞানের চাবিকাঠি’ বলে অভিহিত করেন। এটি শরীয়তের বিধানের পেছনের কার্যকারণ ও দর্শন বোঝার এক অদ্বিতীয় মাধ্যম।

অপরিহার্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার কারণসমূহ:

১. শরীয়তের উদ্দেশ্য (মাকাসিদুশ শরীয়াহ) অনুধাবন:

সাধারণ ফিকহের কিতাবে ‘কী’ (What) এবং ‘কীভাবে’ (How) আলোচনা করা হয়। কিন্তু ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ’-তে ‘কেন’ (Why) প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। কেন নামাজ ফরজ? কেন সুদ হারাম? ইসলামী আইনের এই দার্শনিক ভিত্তি বোঝার জন্য এই কিতাবের কোনো বিকল্প নেই।

- **আরবি ইবারত:** লেখক বলেন, **"الشَّرَائِعُ لَا تَخْلُو عَنْ مَصَالِحَ وَحِكَمٍ"** (শরীয়তের বিধানাবলী কল্যাণ ও হিকমত মুক্ত নয়)।

২. আকল ও নকলের সমন্বয় (التوفيق بين العقل والنقل):

আধুনিক যুগে অনেকেই ধর্মের বিধানকে অযৌক্তিক মনে করে। এই কিতাবটি তাদের জন্য একটি অপরিহার্য দাওয়াতী হাতিয়ার। শাহ ওয়ালী উল্লাহ প্রমাণ করেছেন যে, ওহীর বিধান (নকল) এবং সুস্থ বিবেক (আকল) কখনো পরস্পরবিরোধী হতে পারে না। তিনি ইসলামী আইনকে যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার করে এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

৩. ইরতিফাকাত বা সমাজবিজ্ঞানের পাঠ:

ইসলামী আইন যে কেবল ব্যক্তিগত ইবাদত নয়, বরং তা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার এক পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা—তা বোঝার জন্য এই কিতাব অপরিহার্য। তিনি 'ইরতিফাকাত' (সামাজিক বিবর্তনের ধাপ) তত্ত্বের মাধ্যমে দেখিয়েছেন কীভাবে ইসলাম জঙ্গল থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত মানুষের জীবনকে সুশৃঙ্খল করেছে।

৪. ফিকহ ও হাদিসের সেতুবন্ধন:

অনেক সময় ফিকহী মাসআলা এবং হাদিসের বাহ্যিক অর্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব মনে হয়। এই কিতাবটি সেই দ্বন্দ্ব দূর করে। ফকীহদের জন্য এটি দলিলের ভাণ্ডার, আর মুহাদ্দিসদের জন্য এটি হাদিসের মর্মার্থ বোঝার আয়না।

৫. সর্বজনীনতা ও ভারসাম্য:

এই কিতাবটি কোনো নির্দিষ্ট মাযহাবের অন্ধ সমর্থন করে না। বরং এটি হানাফি, শাফেয়ী, মালিকি ও হাম্বলি মাযহাবের নির্যাস বের করে এনেছে। একারণে সব মাযহাবের শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি 'মারজা' (Reference) বা আকর গ্রন্থ।

৬. রুহানিয়্যাত বা আত্মশুদ্ধি:

ইসলামী আইনের বাহ্যিক কাঠামোর ভেতরে যে আধ্যাত্মিক প্রাণ (Ruh) রয়েছে, তা এই কিতাব পাঠ করলেই কেবল বোঝা সম্ভব। তিনি দেখিয়েছেন, প্রতিটি বিধান কীভাবে মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ (তাযকিয়া) করে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' হলো সেই চশমা, যা চোখে দিলে শরীয়তের বিধানগুলোর প্রকৃত সৌন্দর্য ও গভীরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইসলামী আইনকে নিছক প্রথা মনে না করে একটি বিজ্ঞানসম্মত জীবনব্যবস্থা হিসেবে বোঝার জন্য এই কিতাব পাঠ করা প্রত্যেক আলিম ও গবেষকের জন্য অপরিহার্য।

১৫. ওলামাগণের নিকট “হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ” কিতাবটির প্রতি কেন বিশেষ “এনায়েত” (মনোযোগ) ছিল? কিতাবের ওপর রচিত বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো কী কী?

(لماذا كان لكتاب "حجة الله البالغة" عناية خاصة عند العلماء؟ وما هي الشروح المشهورة التي ألفت على الكتاب؟)

ভূমিকা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ’ রচনার পর থেকেই এটি মুসলিম বিশ্বের ওলামায়ে কেরামের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এই কিতাবের প্রতি ওলামাদের বিশেষ ‘এনায়েত’ বা মনোযোগের প্রমাণ হলো, যুগে যুগে এর পঠন-পাঠন এবং এর ওপর রচিত অসংখ্য শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

বিশেষ এনায়েত বা মনোযোগের কারণসমূহ:

১. বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব (Novelty):

এর আগে আসরারুশ শরীয়াহ বা শরীয়তের রহস্য নিয়ে বিচ্ছিন্ন আলোচনা হলেও, এমন পূর্ণাঙ্গ ও সুবিন্যস্ত কিতাব আর রচিত হয়নি। ওলামায়ে কেরাম এতে এমন এক নতুন ইলমের সন্ধান পান, যা তাঁদের চিন্তার জগতকে প্রসারিত করে।

২. জটিল সমস্যার সমাধান:

দীর্ঘদিন ধরে ফিকহ ও হাদিসের মধ্যে যে দূরত্ব ছিল, এবং মাযহাবগুলোর মধ্যে যে বিরোধ ছিল, এই কিতাব তার যৌক্তিক সমাধান দিয়েছে। একারণে ফকীহ ও মুহাদ্দিস উভয় শ্রেণীর আলেমরা একে লুফে নিয়েছেন।

৩. মুজাদ্দিদের রচনা:

লেখক শাহ ওয়ালী উল্লাহ ছিলেন তাঁর যুগের মুজাদ্দিদ। তাঁর প্রতিটি কথায় ছিল ইলহাম ও আধ্যাত্মিকতার ছাপ। তাই ওলামায়ে কেরাম বরকত ও ইলম অর্জনের জন্য এই কিতাবের প্রতি ঝুঁকেছেন।

৪. পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত:

আরব বিশ্বের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে উপমহাদেশের দারুল উলূম দেওবন্দ পর্যন্ত—সর্বত্র উচ্চতর শ্রেণিতে এই কিতাব পাঠ্য করা হয়েছে। শিক্ষাদানের প্রয়োজনে ওলামায়ে কেরাম এর গবেষণায় মনোনিবেশ করেছেন।

বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ (الشروح المشهورة):

কিতাবটির গভীর ভাব ও ভাষা বোঝার জন্য অনেক আলেম এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে কয়েকটি বিখ্যাত শরাহ হলো:

ক্রম	ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম	রচয়িতা	বৈশিষ্ট্য
১.	**রহমাতুল্লাহিল ওয়াসি'আহ** (رحمة الله الواسعة)	মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরী (রহ.)	এটি উর্দূ ভাষায় রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এতে জটিল বিষয়গুলো অত্যন্ত সহজভাবে বোঝানো হয়েছে। উপমহাদেশের মাদরাসাগুলোতে এটিই সবচেয়ে জনপ্রিয়।
২.	**শারহু হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগাহ** (شرح حجة الله البالغة)	মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী (রহ.)	তিনি শাহ ওয়ালী উল্লাহর রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক দর্শনের আলোকে এই ব্যাখ্যা লিখেছেন। এটি গবেষকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
৩.	**মাওয়াহিবুর রহমান** (مواهب الرحمن)	শায়খ মুহাম্মদ তাকি আমিনী	আরবি ভাষায় রচিত একটি চমৎকার ব্যাখ্যাগ্রন্থ।
৪.	**শামসুল হিকমাত** (شمس الحكمة)	মাওলানা শামসুল হক আফগানী	এটিও একটি নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

উপসংহার:

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' এমন এক কিতাব, যার ওপর ওলামাদের এনায়েত কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এর ওপর রচিত শরাহগুলো প্রমাণ করে যে, এই কিতাবের ইলমী সমুদ্র কত গভীর এবং এর মণি-মুক্তা আহরণে ওলামায়ে কেরাম কতটা তৎপর ছিলেন।

১৬. "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ" কিতাবে শাহ ওয়ালী উল্লাহ কীভাবে ইবাদত (ইবাদাত) ও মু'আমালাত (লেনদেন)-এর বিধানগুলোর দার্শনিক ভিত্তি ও রহস্য ব্যাখ্যা করেছেন?

(كيف شرح الشاه ولي الله في كتابه "حجة الله البالغة" الأسس الفلسفية والأسرار لأحكام العبادات والمعاملات؟)

ভূমিকা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' কিতাবে শরীয়তের বিধানগুলোকে নিছক হুকুম হিসেবে পেশ করেননি। বরং তিনি ইবাদত ও মু'আমালাতের প্রতিটি বিধানের পেছনে লুকিয়ে থাকা দার্শনিক ভিত্তি ও রহস্য (আসরার) উন্মোচন করেছেন। তাঁর মতে, শরীয়তের উদ্দেশ্য হলো মানুষের আত্মিক ও সামাজিক সংশোধন।

১. ইবাদতের দার্শনিক ভিত্তি ও রহস্য (أسرار العبادات):

শাহ ওয়ালী উল্লাহ ইবাদতকে 'রিয়াজাতুন নাফস' বা আত্মশুদ্ধির অনুশীলন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ইবাদতের রহস্যকে চারটি মূল গুণের বিকাশে নিহিত দেখেছেন:

- **তাহারাত (পবিত্রতা):** ওযু ও গোসলের মাধ্যমে কেবল শরীর পরিষ্কার হয় না, বরং এটি মানুষের ভেতর থেকে পশুপ্রবৃত্তি দূর করে এবং ফেরেশত্যাসুলভ গুণাবলি অর্জন করতে সাহায্য করে।
- **ইখবাত (বিনয়):** নামাজের রুকু-সিজদার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সামনে নিজের অহংকার চূর্ণ করে চূড়ান্ত বিনয় প্রকাশ করে। তিনি বলেন, নামাজ হলো **"মুনাজাতুল আবদি ইলা রাব্বিহি"** (রবের সাথে বান্দার গোপন কথোপকথন)।
- **সামাহাত (উদারতা):** যাকাত ও সদকার মাধ্যমে মানুষের মন থেকে কৃপণতা দূর হয় এবং অন্যের প্রতি সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়। এটি অন্তরের সংকীর্ণতা দূর করে।
- **আদালাত (ন্যায়পরায়ণতা):** রোজা মানুষের প্রবৃত্তি দমন করে তাকে সংযমী ও ন্যায়পরায়ণ হতে শেখায়।

২. মু'আমালাতের দার্শনিক ভিত্তি ও রহস্য (أسرار المعاملات):

লেনদেন ও সামাজিক বিধানের ক্ষেত্রে তিনি 'ইরতিফাকাত' (সামাজিক উন্নয়ন) ও 'আদালাত' (ন্যায়বিচার)-কে ভিত্তি হিসেবে ধরেছেন।

- **অর্থনৈতিক লেনদেন:** ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা ইত্যাদির ক্ষেত্রে শরীয়তের মূল রহস্য হলো **'পারস্পরিক সহযোগিতা'** এবং **'ঝগড়া বিবাদ নিরসন'**। তিনি বলেন, সুদ ও জুয়া হারাম হওয়ার কারণ হলো, এগুলো সমাজে শোষণ ও শত্রুতা সৃষ্টি করে এবং মানুষের কর্মস্পৃহা নষ্ট করে।

- **পারিবারিক আইন:** বিবাহ, তালাক ও মিরাসের বিধানগুলো দেওয়া হয়েছে সমাজকে বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করতে এবং নারী-পুরুষের অধিকার নিশ্চিত করতে। তিনি বলেন, পরিবার হলো সমাজের প্রাথমিক ইউনিট, তাই এর পবিত্রতা রক্ষা জরুরি।

- **দণ্ডবিধি (হুদুদ ও কিসাস):** চোরের হাত কাটা বা হত্যার বদলা হত্যা—এগুলো নিষ্ঠুরতা নয়, বরং সমাজের শান্তি রক্ষার জন্য অপরিহার্য। এর রহস্য হলো **"জাজর"** (ধমক) ও **"ইসলাহ"** (সংশোধন)। অপরাধীকে শাস্তি দিলে পুরো সমাজ নিরাপদ থাকে।

আরবি ইবারত:

তিনি মু'আমালাতের মূলনীতি সম্পর্কে বলেন:

"الْمَقْصُودُ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ إِقَامَةُ الْعَدْلِ وَدَفْعُ التَّظَالُمِ بَيْنَ النَّاسِ"

(মু'আমালাতের উদ্দেশ্য হলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের মধ্যকার জুলুম-শোষণ দূর করা।)

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ প্রমাণ করেছেন যে, ইবাদত মানুষকে 'রাব্বানী' (আল্লাহওয়ালা) বানায়, আর মু'আমালাত সমাজকে 'মাদানী' (সভ্য) বানায়। তাঁর এই দার্শনিক ব্যাখ্যা ইসলামী শরীয়তকে এক ভারসাম্যপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

১৭. ইসলামী দর্শনে শাহ ওয়ালী উল্লাহর অবদান কী? এ কিতাবে বর্ণিত "ইরতিফাকাত" (ইরতিফাকাত)-এর ধারণাটি বিশ্লেষণ কর।
(ما هي مساهمة الشاه ولي الله في الفلسفة الإسلامية؟ وحلل مفهوم " الارتفاقات " المذكور في هذا الكتاب)

ভূমিকা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.) কেবল একজন মুহাদ্দিস বা ফকীহ ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন উচ্চমানের সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিক। তাঁর রচিত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' গ্রন্থে তিনি মানব সমাজের ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনকে 'ইরতিফাকাত' তত্ত্বে ব্যাখ্যা করেছেন। সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে ইবনে খালদুনের পরেই শাহ ওয়ালী উল্লাহর এই দর্শনকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়।

ইসলামী দর্শনে অবদান (المساهمة في الفلسفة الإسلامية):

১. সমাজ ও ধর্মের সমন্বয়: তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ধর্ম কোনো সমাজবিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। বরং সমাজের সুস্থ বিকাশের জন্যই ধর্মের প্রয়োজন।

২. মানব ইতিহাসের ব্যাখ্যা: তিনি মানব ইতিহাসকে নিছক ঘটনার সমষ্টি হিসেবে না দেখে, একটি ক্রমবিকাশমান ধারা হিসেবে দেখেছেন যা পূর্ণতার দিকে ধাবিত হয়।

৩. রাষ্ট্রদর্শন: তিনি রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রয়োজনীয়তা এবং খিলাফতের দায়িত্ব নিয়ে যে দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনন্য।

ইরতিফাকাত-এর ধারণা ও বিশ্লেষণ (تحليل مفهوم الارتفاقات):

সংজ্ঞা:

'ইরতিফাকাত' (الِارْتِفَاقَاتُ) শব্দটি 'ইরতিফাক' (اِرْتِفَاقٌ) এর বহুবচন। এর অর্থ হলো—সহযোগিতা গ্রহণ করা, অবলম্বন করা বা কোনো কিছুর ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো। পরিভাষায়, মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজন পূরণের জন্য ধাপে ধাপে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে, তাকে ইরতিফাকাত বলে।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ ইরতিফাকাতকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন:

১. প্রথম ইরতিফাক (আল-ইরতিফাকুল আউয়াল):

এটি হলো মানব সভ্যতার প্রাথমিক স্তর বা 'বন্য জীবন'। এ স্তরে মানুষ কেবল তার মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করে। যেমন—

- খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ।
- লজ্জা নিবারণের জন্য পোশাক।
- রোদ-বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য বাসস্থান।
- আত্মরক্ষার ব্যবস্থা।

এ স্তরে কোনো আইন বা রাষ্ট্র থাকে না, শুধু বেঁচে থাকার সংগ্রাম থাকে।

২. দ্বিতীয় ইরতিফাক (আল-ইরতিফাকুস সানি):

যখন মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে সমাজবদ্ধ হতে শুরু করে। এ স্তরে মানুষ গ্রাম বা মহল্লা তৈরি করে এবং একে অপরের সাথে লেনদেন শুরু করে। এ স্তরের বৈশিষ্ট্য:

- কৃষি ও শিল্পকলা আবিষ্কার।
- পোশাক ও খাদ্যে রুচিশীলতা।
- বিয়ে ও পারিবারিক ব্যবস্থা।
- পারস্পরিক লেনদেনের নিয়মকানুন (ক্রয়-বিক্রয়)।

এখানেই মূলত 'আদব' বা শিষ্টাচারের জন্ম হয়।

৩. তৃতীয় ইরতিফাক (আল-ইরতিফাকুস সালিস):

যখন সমাজ বড় হয়ে নগরে পরিণত হয় এবং মানুষের মধ্যে বিরোধ, লোভ ও হিংসা দেখা দেয়। তখন সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রশাসন বা রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয়। এ স্তরের বৈশিষ্ট্য:

- বিচার ব্যবস্থা (কাজা) ও দণ্ডবিধি (হুদুদ) প্রয়োগ।
- কর (Tax) আদায় ও বায়তুল মাল গঠন।
- সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনী গঠন।
- একজন আমির বা রাজা নির্বাচন।

এ স্তরে মানুষ পূর্ণাঙ্গ নাগরিক জীবনে প্রবেশ করে।

৪. চতুর্থ ইরতিফাক (আল-ইরতিফাকুর রাবে):

এটি সভ্যতার সর্বোচ্চ স্তর। যখন ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলো একে অপরের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, তখন বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আন্তর্জাতিক শক্তি বা 'খিলাফত'-এর প্রয়োজন হয়। একে 'আল-খিলাফাতুল কুবরা' বলা হয়। এর কাজ হলো বিশ্বজুড়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং জুলুম প্রতিরোধ করা।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর এই 'ইরতিফাকাত' তত্ত্ব প্রমাণ করে যে, শরীয়ত কোনো বিচ্ছিন্ন আইন নয়। বরং সমাজ যখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইরতিফাকে পৌঁছায়, তখন আল্লাহ তায়ালা নবী পাঠিয়ে শরীয়তের মাধ্যমে সেই সমাজকে সুশৃঙ্খল করেন। তাঁর এই দর্শন ইসলামী সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছে।

---

১৮. "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ" কিতাবে বর্ণিত শরীয়তের সর্বজনীন উপকারিতা (মাসালিহুল কুল্লিয়্যাহ) ও এর উদ্দেশ্য (মাকাসিদুশ শরীয়াহ)-এর মূলনীতিগুলো কী কী?

(ما هي المبادئ الأساسية للمصالح الكلية ومقاصد الشريعة المذكورة في كتاب " حجة الله البالغة " ؟)

ভূমিকা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর দর্শনের মূল কথা হলো—শরীয়তের কোনো বিধানই হিকমত ও মাসলাহাত (জনকল্যাণ) মুক্ত নয়। তিনি 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' গ্রন্থে শরীয়তের বিধানগুলোকে মানুষের স্বভাবজাত গুণাবলী ও মাকাসিদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। তিনি মাসালিহুল কুল্লিয়্যাহ বা সর্বজনীন উপকারের ভিত্তি হিসেবে চারটি মূলনীতির কথা উল্লেখ করেছেন।

মাসালিহুল কুল্লিয়্যাহর চারটি মূলনীতি (চারটি স্বভাবজাত গুণ):

শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, মানুষের রুহ বা আত্মাকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য চারটি মৌলিক গুণ অর্জন করা জরুরি। শরীয়তের

সকল বিধান এই চারটি গুণ অর্জনের জন্যই দেওয়া হয়েছে। এগুলোকে 'আখলাকে আরবা'আ' বা চারিত্রিক গুণাবলী বলা হয়:

১. তাহারাত (পবিত্রতা):

মানুষের স্বভাব হলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা। শরীয়ত ওযু, গোসল এবং নাপাকি থেকে বাঁচার বিধান দিয়েছে যাতে মানুষের পাশবিকতা দূর হয় এবং ফেরেশতাদের মতো নূরানিয়্যাত তৈরি হয়।

- **উদ্দেশ্য:** রুহানি প্রশান্তি ও আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার যোগ্যতা অর্জন।

২. ইখবাত (বিনয় ও আল্লাহর প্রতি সমর্পণ):

স্রষ্টার সামনে নিজেকে তুচ্ছ মনে করা এবং তাঁর মহত্ত্বের কাছে মাথা নত করা মানুষের স্বভাব। নামাজ, জিকির ও দোয়ার মাধ্যমে এই গুণ অর্জিত হয়।

- **উদ্দেশ্য:** অন্তরের অহংকার দূর করা এবং রবের দাসত্ব স্বীকার করা।

৩. সামাহাত (উদারতা ও নির্লোভতা):

মানুষের অন্তরে সম্পদের লোভ ও কৃপণতা থাকে যা তাকে পশুত্বের স্তরে নামিয়ে দেয়। যাকাত, সদকা ও দান-খয়রাতের মাধ্যমে এই লোভ দমন করা হয় এবং অন্তরে উদারতা (সাখাওয়াত) তৈরি হয়।

- **উদ্দেশ্য:** দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে আখেরাতমুখী হওয়া।

৪. আদালাত (ন্যায়পরায়ণতা):

সমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য ন্যায়বিচার জরুরি। জুলুম, অত্যাচার ও হক নষ্ট করা থেকে বিরত থাকার নাম আদালাত। মু'আমালাত, বিবাহ, তালাক ও দণ্ডবিধির বিধানগুলো এই গুণ প্রতিষ্ঠার জন্য দেওয়া হয়েছে।

- **উদ্দেশ্য:** সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

মাকাসিদুশ শরীয়াহর মূলনীতি (مقاصد الشريعة):

শাহ ওয়ালী উল্লাহর মতে, শরীয়তের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো মানুষকে 'সাআদাহ' বা সৌভাগ্যমণ্ডিত করা। আর এই সৌভাগ্য অর্জনের জন্য শরীয়ত পাঁচটি বিষয় সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দেয় (যাকে মাকাসিদুশ শরীয়া বলে):

১. দ্বীন রক্ষা: ইবাদত ও জিহাদের মাধ্যমে।

২. জান বা জীবন রক্ষা: কিসাস ও হত্যার শাস্তির মাধ্যমে।

৩. আকল বা বুদ্ধি রক্ষা: মদ ও নেশা হারাম করার মাধ্যমে।

৪. নসল বা বংশ রক্ষা: ব্যভিচার হারাম ও বিবাহের মাধ্যমে।

৫. মাল বা সম্পদ রক্ষা: চুরি ও ডাকাতির শাস্তির মাধ্যমে।

উপসংহার:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ প্রমাণ করেছেন যে, শরীয়তের বিধানগুলো কোনো যান্ত্রিক প্রথা নয়। বরং তাহারাত, ইখবাত, সামাহাত ও আদালাত—এই চারটি গুণের বিকাশ ঘটিয়ে মানুষকে 'ইনসানে কামিল' বা পরিপূর্ণ মানুষে রূপান্তর করাই শরীয়তের মাসলাহাত বা উদ্দেশ্য।

---

১৯. এ কিতাবের মাধ্যমে শাহ ওয়ালী উল্লাহ কীভাবে সুন্নাহ ও সুন্নাহর সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন?

(كيف أبرز الشاه ولي الله أهمية السنة وحفظها من خلال هذا الكتاب؟)

ভূমিকা:

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.)-কে বলা হয় ভারতীয় উপমহাদেশের মুহাদ্দিসগণের ইমাম। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'-তে তিনি সুন্নাহ বা হাদিসের গুরুত্ব, এর প্রামাণ্যতা এবং হাদিস সংরক্ষণের পদ্ধতি নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, তা হাদিস শাস্ত্রের ইতিহাসে এক মাইলফলক। তিনি হাদিসকে শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে কেবল মৌখিকভাবে নয়, বরং যৌক্তিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

সুন্নাহর গুরুত্ব ও মর্যাদা (أهمية السنة):

১. কুরআনের ব্যাখ্যাতা:

তিনি বলেন, সুন্নাহ ছাড়া কুরআন বোঝা অসম্ভব। কুরআনের সংক্ষিপ্ত (মুজমাল) বিধানগুলোর বিস্তারিত রূপ হলো সুন্নাহ। তাই সুন্নাহকে বাদ দিয়ে দ্বীন পালন করা মানে কুরআনের অপব্যাখ্যা করা।

- **দলিল:** তিনি প্রমাণ করেন যে, রাসূল (সা.)-এর প্রতিটি আমল ও নির্দেশ আল্লাহর ওহী (ওহীয়ে গায়ের মাতলু) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল।

২. হাদিসের স্তরবিন্যাস (তবকাতে কুতুবে হাদিস):

সুন্নাহর সংরক্ষণের স্বার্থে তিনি হাদিসের কিতাবগুলোকে বিশুদ্ধতার বিচারে ৫টি স্তরে (Tabaqat) ভাগ করেছেন। এটি তাঁর এক অনন্য অবদান:

- **প্রথম স্তর:** মুয়াত্তা মালিক, বুখারী ও মুসলিম। (এগুলো শতভাগ বিশুদ্ধ)।
- **দ্বিতীয় স্তর:** সুনানে আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ। (এগুলো প্রায় বিশুদ্ধ)।
- **তৃতীয় স্তর:** মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী ইত্যাদি। (এতে সহীহ ও যয়ীফ মিশ্রিত)।
- **চতুর্থ স্তর:** দুর্বল ও অপরিচিত রাবীদের হাদিস।
- পঞ্চম স্তর: জাল ও বানোয়াট হাদিস।

এই বিন্যাসের মাধ্যমে তিনি সুন্নাহকে জাল হাদিস থেকে রক্ষা করেছেন।

৩. মুয়াত্তা মালিকের প্রাধান্য:

তিনি ইমাম মালিক (রহ.)-এর 'মুয়াত্তা' গ্রন্থটিকে সুন্নাহর মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি মনে করতেন, ফিকহী ইখতিলাফ নিরসনে মুয়াত্তা মালিক সবচেয়ে কার্যকর।

৪. আকল ও সুন্নাহর সমন্বয়:

তৎকালীন যুক্তিবাদীরা হাদিসের কিছু বিষয়কে অযৌক্তিক বলে আক্রমণ করত। শাহ ওয়ালী উল্লাহ প্রতিটি হাদিসের পেছনের হিকমত ও রহস্য (আসরার) বর্ণনা করে প্রমাণ করেছেন যে, সুন্নাহ সর্বদা যুক্তিসঙ্গত। এতে হাদিসের প্রতি মানুষের আস্থা ফিরে এসেছে।

৫. ফিকহের ওপর সুন্নাহর প্রাধান্য:

তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, যদি কোনো মুজতাহিদের রায় সহীহ হাদিসের বিপরীত হয়, তবে হাদিস মানাই ওয়াজিব এবং রায় বর্জনীয়। তিনি মাযহাবী গোঁড়ামি থেকে বেরিয়ে এসে সুন্নাহর অনুসরণের ওপর জোর দিয়েছেন।

উপসংহার:

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' কিতাবের মাধ্যমে শাহ ওয়ালী উল্লাহ সুন্নাহকে কেবল একটি শাস্ত্র হিসেবে নয়, বরং ইসলামি জীবনব্যবস্থার প্রাণশক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি হাদিসের সনদ ও মতন (টেক্সট) উভয়টি সংরক্ষণের যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দেখিয়েছেন, তা সুন্নাহর হেফাজতের এক অটুট দুর্গ।

---

২০. "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ" কিতাবটি কেন ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী চিন্তা ও শিক্ষায় একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিল- বিশ্লেষণ কর।

(حلل لماذا أحدث كتاب " حجة الله البالغة " تغييرا جذريا في الفكر والتعليم الإسلامي في شبه القارة الهندية؟)

ভূমিকা:

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামি শিক্ষার ইতিহাসে শাহ ওয়ালী উল্লাহর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' প্রকাশের কালকে একটি 'সন্ধিক্ষণ' বা টার্নিং পয়েন্ট বলা হয়। এই একটি কিতাব উপমহাদেশের শত বছরের গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন এনেছিল। একে বলা হয় 'বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব'।

যুগান্তকারী পরিবর্তন ও প্রভাব বিশ্লেষণ (التحليل):

১. মানতিক-ফালসাফা থেকে কুরআন-সুন্নাহমুখী:

শাহ ওয়ালী উল্লাহর আগে ভারতের মাদরাসাগুলোতে গ্রিক দর্শন (মানতিক) এবং ফিকহের খুঁটিনাটি তর্কের চর্চা বেশি ছিল। কুরআন ও হাদিস ছিল অবহেলিত। 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' প্রকাশের পর ওলামায়ে কেরাম বুঝতে পারেন যে, আসল ইলম হলো ওহীর ইলম। ফলে পাঠ্যক্রমে হাদিসের গুরুত্ব বাড়ে এবং 'দাওরায়ে হাদিস' চালু হয়।

২. মাযহাবী সহনশীলতা সৃষ্টি:

আগে হানাফি ও শাফেয়ী বা অন্যান্য মাযহাবের মধ্যে চরম বিরোধ ছিল। এই কিতাব প্রমাণ করে যে, সব মাযহাবই হকের ওপর আছে এবং ইখতিলাফগুলো স্বাভাবিক। এর ফলে আলেমদের মধ্যে উদারতা ও ঐক্যের মানসিকতা তৈরি হয়।

৩. আধুনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা:

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও নাস্তিক্যবাদের প্রভাবে যখন মুসলিম যুবসমাজ ইসলামের বিধানকে 'কুসংস্কার' ভাবতে শুরু করেছিল, তখন এই কিতাব শরীয়তের যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিয়ে তাদের ঈমান রক্ষা করে। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলাম আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত।

৪. রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা:

কিতাবটিতে বর্ণিত 'ইরতিফাকাত' (সমাজনীতি) ও 'সিয়াসাতুল মিল্লিয়াহ' (রাজনীতি) অধ্যায়গুলো আলেম সমাজকে খানকাহ থেকে বের করে রাষ্ট্র ও সমাজ নিয়ে ভাবতে শিখিয়েছে। এর ফলেই পরবর্তীতে সিপাহী বিপ্লব, রেশমী রুমাল আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্ম হয়েছে।

৫. তাসাউফের সংস্কার:

তিনি প্রচলিত ভণ্ড পীরতন্ত্র ও বিদআতের মূলে কুঠারাঘাত করেন। তিনি তাসাউফকে শরীয়তের অধীন করেন এবং আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত রূপরেখা তুলে ধরেন।

৬. দেওবন্দি চিন্তাধারার ভিত্তি:

দারুল উলূম দেওবন্দ এবং এর অনুসারী হাজার হাজার মাদরাসার সিলেবাস ও চিন্তাধারা মূলত এই কিতাবের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। উপমহাদেশের

আলেমদের ‘মিজাজ’ বা রুচি তৈরিতে এই কিতাবের অবদান এককভাবে সবচেয়ে বেশি।

উপসংহার:

‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ’ কেবল একটি বই নয়, এটি একটি আলোকবর্তিকা। এটি ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের অন্ধকারের যুগ থেকে বের করে কুরআন-সুন্নাহর আলোকিত রাজপথে নিয়ে এসেছিল। আজকের বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের ইসলামি শিক্ষার যে কাঠামো আমরা দেখি, তা অনেকাংশেই এই কিতাবের বৈপ্লবিক প্রভাবের ফসল।